ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1739- 1746
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.396

কিন্নর রায়ের ‘অন্ধকারের ছবি’: সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্ব ও অস্তিত্বের সংকট

সোনালী কুণ্ডু, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Kinnar Roy, a distinguished figure in contemporary Bengali literature, is celebrated for his profound portrayal of marginalized lives. This paper provides a comprehensive analysis of his notable novel 'Andhokarer Chobi' (1992), which serves as a poignant document of the psychological and existential crises faced by the Muslim minority in late 20th-century West Bengal. Through the protagonist, Ansar, the narrative explores the deep-seated fear of social exclusion that compels individuals to conceal their religious identity, epitomized by the symbolic renaming of his garage to ‘Mishtu Automobiles’.

The study examines how a lack of formal education and an all-pervasive inferiority complex foster alienation and a sense of belonging to another mental landscape. It further delves into the community's internal complexities, including the sectarian friction between Shia and Sunni groups and the influence of religious conservatism like the Tablighi movement. Additionally, the paper highlights the intersectional struggles of women like Rahima, who navigate a rigid patriarchal structure. By situating the 1992 text within the broader context of post-partition social polarization, the article demonstrates the novel's enduring relevance. Ultimately, ‘Andhokarer Chobi’ acts as a mirror to a fragmented society, capturing a tragic quest for dignity amidst systemic insecurity.

Keywords: Minority Psychology, Existential Crisis, Kinnar Roy, Social Insecurity, Religious Divide

যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের মাটিতে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ এসেছে। কেউ এসেছে শাসন করতে, আবার কেউ নিছক ভাগ্যান্বেষণে। তাদের মধ্যে অনেকেই এদেশকে ভালোবেসে থেকে গেছে এবং এই দেশের মাটির সাথে মিশে গেছে। ভারতবর্ষের এই উদার ভূমি সবাইকে পরম মমতায় আপন করে নিয়েছে। যদিও সময়ের প্রবাহে কখনও কখনও পারস্পরিক দূরত্ব বা বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে, তবুও নানা জাতি, নানা ভাষা ও ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ চিরকাল ‘মহামানবের পুণ্যতীর্থ’। তাই তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে এই পুণ্যতীর্থে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—

> “এসো হে আর্য, এসো হে অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
> এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
> এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
> এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।"[১]

ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক ইত্যাদি বহু ধর্মের মানুষের বাস। এই দেশের মতো এমন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোনো দেশে দেখা যায় না, যেখানে সাতটি বড় ধর্ম এবং অসংখ্য উপভাষায় মানুষ কথা বলে। সুতরাং, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, বেশভূষা কিংবা খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র্য থাকাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। জনসংখ্যার বিচারে ভারতে মুসলমানদের স্থান হিন্দুদের ঠিক পরেই। ভারতের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জীবনধারা সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা অনেকেই সঠিকভাবে জানি না। এর অন্যতম প্রধান কারণ সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব। ভারতবর্ষের মাটিতে হিন্দু ও মুসলমান— এই দুই সম্প্রদায় দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করলেও হৃদয়ের টানে একে অপরের খুব একটা কাছে আসতে পারেনি। কিন্তু অখণ্ড ভারতবর্ষকে চিনতে হলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার জীবনছন্দকে উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এই জানার তাগিদেই আমরা সাহিত্যের শরণাপন্ন হই। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন ও তাঁদের অন্তরের কথা আমরা অনেকটাই সাহিত্যের পাতায় খুঁজে পাই। তবে এটি ঠিক যে, বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্নে অমুসলিম লেখকদের কলমে সাধারণ মুসলমান সমাজজীবন সেভাবে ফুটে ওঠেনি। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে—

> "হিন্দু (অমুসলিম) লেখকরা খানদানি মুসলিমদের কাছাকাছি এসেছিলেন, কিন্তু গ্রাম বাংলার চাষি, মজুর, মুসলিমদের ঘরের উঠোন পর্যন্ত তাঁদের দৃষ্টি এসে পৌঁছায়নি। এইজন্য বাংলা গল্প, উপন্যাসের প্রথমদিকে হিন্দু গল্পকার এবং ঔপন্যাসিকদের কলমে রাজা-রানী, বাদশা-বেগমদের কথাই উঠে এসেছে। এছাড়াও বাস্তব জীবনে নানা কারণে মুসলিম সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা (ধারণা) ছিল সীমাবদ্ধ। তেমনি মুসলিমরাও সাহিত্য চর্চায় তেমন আগ্রহ দেখায়নি। মুসলিম লেখকরা যদি তাঁদের নিজের সমাজ ও জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা করতেন, তাহলে হিন্দু লেখকদের পক্ষে মুসলিম সমাজকে জানা ও চেনা সহজ হত।"[২]

তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কথাসাহিত্যে এবং সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধারার সাহিত্যিকদের লেখনীতে 'আরশি নগরের পড়শি' এই মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবনধারা ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক যুগের লেখকদের হাত ধরে তাঁদের সমাজবাস্তবতা এবং মানসিক টানাপোড়েনের চিত্রগুলো আরও স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে আমাদের সামনে ধরা দিয়েছে।

বর্তমান সময়ের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাকার কিন্নর রায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পারসিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে আখ্যান নির্মাণ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস— "...আমার দেশ কখনো শুধুমাত্র হিন্দুর দেশ নয়, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, পারসিক–এদের সকলের দেশ।"[৩] লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, আমাদের দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা মানসিকভাবে সংখ্যাগুরু সমাজ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন থাকেন। এর ফলে সংখ্যাগুরু হিসেবে আমরা যেমন তাঁদের অন্দরমহল সম্পর্কে জানি না, তাঁরাও হয়তো আমাদের সম্পর্কে একই রকম ধারণা পোষণ করেন। এভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান নিরন্তর বেড়ে চলেছে। আমরা যাদের সুখ-দুঃখের হদিস রাখি না, তাদের সাথে আমাদের আত্মিক মিলন ঘটা প্রায় অসম্ভব। এই দায়বদ্ধতা থেকেই কিন্নর রায় ইসলামধর্মী মানুষের জীবন ও সমাজকে তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। লেখকের যেসব উপন্যাসে এই জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে, সেগুলো হলো— 'অন্ধকারের ছবি' (১৯৯২), 'আগুনের সিঁড়ি' (১৯৯৩),

'নিরপেক্ষ' (১৯৯৪), 'সংখ্যালঘু' (১৯৯৫) ইত্যাদি। ছাড়াও তাঁর বিভিন্ন গল্পগ্রন্থে মুসলিম সমাজের নিরাপত্তাহীনতা, ধর্মীয় রীতিনীতি, সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং মুসলিম নারীদের অবস্থান নিটোল বাস্তবতায় ধরা পড়েছে। লেখক এই মানুষদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন বলেই হয়তো এই সমাজের খুঁটিনাটির চিত্র নিখুঁতভাবে তাঁর লেখায় তুলে ধরতে পেরেছেন—

> "...মুসলিম সমাজ, জীবন, ধর্মীয় ব্যাপার, গোপন সমস্যা, যাবতীয় বিষয় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ (সূক্ষ্ম) ব্যাখ্যা (অনুসন্ধান) নিখুঁত বর্ণনা আর অন্তরের দরদ ঢেলে চরিত্রগুলোর অঙ্কন—এ সবই যেন বুঝিয়ে দেয় কিন্নর রায় মুসলিম সমাজের একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি কিংবা মুসলিম সমাজের দর্পণ।"[৪]

এই প্রবন্ধে কিন্নর রায়ের 'অন্ধকারের ছবি' উপন্যাসে সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্বের আলোকে ইসলামধর্মী মানুষের জীবনযাপন এবং সংখ্যাগুরু সমাজের প্রতি তাঁদের মনোভঙ্গি কীভাবে চিত্রিত হয়েছে, তাই হবে আমাদের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু।

আলোচ্য 'অন্ধকারের ছবি' (১৯৯২) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো এক বিশেষ সময়ের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমান জনমানষের নিরাপত্তাহীনতা ও অস্তিত্বের সংকট। পাশাপাশি ঔপন্যাসিক এই বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন ও তাঁদের বহুমুখী সমস্যার এক নিপুণ আলেখ্য নির্মাণ করেছেন। প্রধান চরিত্র 'আনসার'-কে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসটি তিন দশক আগের অস্থির সামাজিক পটভূমিতে লেখা হলেও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এর বিষয়বস্তু ও সংকটগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও সাম্প্রদায়িক বিভেদ আর ধর্মীয় মেরুকরণের বিষবাষ্প আজও সমাজমানসে বর্তমান। এমনই এক গুমোট পরিস্থিতিতে লেখক তুলে ধরেছেন আনসারের মতো সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক মানুষের কথা, যারা কেবল 'মুসলমান' এই ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে এক ভিন্ন মানসিক ভূখণ্ডে বাস করতে বাধ্য হয়। মূলত কলকাতার ভৌগোলিক সীমানার ভেতরেই এক 'অ-কলকাতা'র জনপদে বসবাসকারী সংখ্যালঘু বাঙালি মুসলমান সমাজের যাপনের এক জীবন্ত দলিল এই উপন্যাস।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আনসার উপলব্ধি করে যে, কোনো 'ধর্মীয় পরিচয়বাহী' নামে নিজের গ্যারাজের নাম রাখলে জীবিকা নির্বাহে বা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই সে নিজের গ্যারেজের নাম রাখে 'মিষ্টু অটোমোবাইলস'। কেবল পেশাগত সুবিধাই নয়, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার আশায় সে বিভিন্ন হিন্দু উৎসবে বা সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রেও নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখে। শুধু আনসার নয়, তার গ্যারেজের অন্যান্য মুসলিম কর্মচারীরাও 'দিলীপ' বা 'বাবুয়া'-র মতো হিন্দু ছদ্মনামে নিজেদের পরিচয় দেয়। প্রশ্ন জাগে, কেন তারা এই আত্মপরিচয় প্রকাশে এতটা দ্বিধা বা হীনম্মন্যতায় ভোগে? আসলে এর গভীরে নিহিত আছে এক গভীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট। লেখকের ভাষায়—

> "এই ঘটনাটুকু থাকেই–ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স–আমি মুসলমান, আমার সঙ্গে ওরা মিশবে না। আর বাস্তব তো তাই-ই। মানুষ হিসেবে এখনও তো সম্মান পাওয়া হয়ে ওঠে না পুরোপুরি, শুধু এই নাম পদবী অথবা জীবন-যাপনের আচার-আচরণে। বিচ্ছিন্নতা গোপনে বাড়ে। অপমানে অপমানে একজন মানুষ সত্যিকারের 'বাগি' হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চায়। এই নাম বদলের আবরণটুকু থেকেই মিষ্টু অটোমোবাইলস। সেই নামে ছাপানো প্যাড। জীবন এরকমই।"[৫]

পরিচয় গোপনের এই মানসিক চাপ ও বাধ্যবাধকতা থেকেই আনসারের মনে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ জন্মায়। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে সে সব সময় সংশয়ের মধ্যে থাকে। এভাবেই এক বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ আমাদের সমাজে দিন দিন বেড়েই চলেছে। লেখক এই উপন্যাসে কেবল পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিরাপত্তাহীনতার কথাই বলেননি, বরং বাংলাদেশের হিন্দুরাও যে একই সমস্যার শিকার— সে কথা জানাতেও ভোলেননি। বাংলাদেশের রং-মিস্ত্রি সুরেন দেবনাথ এপার বাংলায় কাজের সূত্রে থাকলেও সংখ্যালঘুদের এই সংকট সম্পর্কে বেশ অবগত। কারণ বাংলাদেশেও অবস্থা একই রকম। তার ভাই মন্টু, যার ভালো নাম হরেন— সে বাংলাদেশে 'সাফদার হোসেন মন্টু' নামে সিরামিক টালির ব্যবসা করে। এই পরিচয় লুকানোর ফলে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তার 'পার্টি' বা 'পেমেন্ট' পেতে সুবিধা হয়। নিজের দেশ ও পরিবার থেকে দূরে এসে সুরেনের মন সব সময় ছটফট করে, কিন্তু দেশে ফেরার কোনো আশা তার আর নেই; কারণ অভাব আর অর্থ উপার্জনের টানে সে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

ইসলামধর্মে বিশ্বাসী আনসার ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে চায় মূলত জীবনের সব 'না-পাওয়া'-র দুঃখকে মুছে ফেলতে। তার এই 'না-পাওয়া' কেবল অভাব-অনটন নয়, বরং সমাজে আত্মসম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার আকুলতা। ধর্মকে গুরুত্ব দিলেও কাজের চাপে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া হয় না, তবে সে নিয়ম করে শুক্রবারের 'জুম্মা' পড়তে যায়। নামাজের মতো ধর্মীয় আচারের মধ্য দিয়ে আনসার নিজের মদের নেশাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু অনেক সময়ই নিজেকে সামলাতে পারে না। ইসলামে মদ বা সুদ নিষিদ্ধ জেনেও মাঝেমধ্যে মদ খায় আর ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। এমনকি পতিতা নারীদের সঙ্গেও মেলামেশা করে। আসলে লেখক আনসারকে এমন এক সাধারণ যুবক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে এঁকেছেন, যাদের আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজেই দেখতে পাই। মূলত আনসারের এই মদ খাওয়া বা নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াত আসলে কোনো চারিত্রিক বিলাসিতা নয়, বরং এটি তার যন্ত্রণাময় জীবন থেকে এক ধরনের পলায়নবৃত্তি (Escapism)। জীবনের না-পাওয়া আর অভাবের গ্লানি সাময়িকভাবে ভুলে থাকতেই সে এই নেশার আশ্রয়ে নিজের ভেতরের জ্বালাটুকু নিভিয়ে ফেলতে চায়।

সংসারের দায়িত্বের ভারে আনসার ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত। তার পৈতৃক বাড়ি কামালগাজিতে হলেও ছেলেবেলা থেকেই সে ব্রহ্মপুরে মামাবাড়িতে মানুষ হয়েছে। বাবার দায়িত্বহীনতার কারণে অতি অল্প বয়সেই তাকে উপার্জনের তাগিদে ঘর ছাড়তে হয়। তার বাবা কেবল ধর্মের নেশায় মেতে থেকে স্ত্রী ও দশটি সন্তানের কোনো খোঁজ রাখেননি। তাবলিগ-জামাত, আল্লা-চিন্তা, পরকালের 'বেহস্তের রাস্তা' পাকা করার ভাবনায় ডুবে থেকে তিনি সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বিপরীতে আনসারের মায়ের জীবন হয়ে উঠেছিল এক অন্তহীন সংগ্রাম। একজন সাধারণ মুসলিম গৃহবধূর পক্ষে দশটি সন্তান নিয়ে একা সংসার চালানো যে কতটা দুঃসহ ও যন্ত্রণার, আনসারের মায়ের জীবন তারই এক করুণ দৃষ্টান্ত। এখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মুসলিম পরিবারের প্রান্তিক নারীদের অসহায়ত্বের এক করুণ ছবি ফুটে ওঠে। বাবার এই দায়িত্বহীনতা সম্পর্কে আনসার বলেছে—

> "মাঝে মাঝে আমরা ভাই-বোনেরা হয়েছি। মাথায় বেড়েছি। বাবা এসব ভাবে নি। অর্থ রোজগারের কথা ভাবে নি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ডিসিপ্লিনে তার পায়ের পাতার কড়া, সিজদায় সিজদায়–ক্রমাগত প্রণামে কপালে কালো দাগ। মুঠ ভরা তবলিগি দাড়ি। ছোট করে ছাঁটা চুল, যাতে টুপির বাইরে না যায়। গোঁফের চুল যাতে না জলে পড়ে। প্রতি বছর নিয়ম করে রোজা–ইসলামী আরও নানা নিতকিত।"[৬]

শিক্ষা মানুষের জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্তানকে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব মূলত বাবা-মায়ের ওপরই থাকে। তবে শৈশবে বাবার সাংসারিক উদাসীনতার কারণে আনসার ও তার ভাইবোনদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়ে ওঠেনি। আনসার ও আক্রাম বড়জোর পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কেবল কায়দা করে ইংরেজিতে নাম লিখতে পারা এবং ক্লাস এইট পাসের একটি সার্টিফিকেট থাকায় কোনোমতে কাজের বাজারে তারা টিকে আছে। অন্যদিকে তার বোনেরা কেবল মসজিদে আরবি পড়ার মতো যৎসামান্য শিক্ষা পেয়েছে। এই অপূর্ণতা আনসারের মনে এক ধরণের মানসিক জড়তা তৈরি করে এবং সমাজে চলার পথে তাকে বারবার ধাক্কা খেতে হয়। আনসার নিজের এই অপূর্ণতা নিয়ে ভাবে—

> "...পৃথিবীর দরজা যে অনেক বড়। এখন বুঝতে পারি। পার্টিকে কাজের কোনো টেন্ডার বা বিল দেয়ার সময়, অথবা ব্যাঙ্কের চেক সই করে জমা দিতে গেলে নিজেকে ইংরেজি না জানা পাথর মনে হয়। অপমান বাজে। অনেক কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না, বলতে, বোঝাতে পারি না। এখানে আমার বয়েসীরা প্রায় সবাই এরকম। অথচ বাবা যদি গোল টুপি, লম্বা টুপি, দাড়ির মাপ না করে আমাদের লেখা-পড়ায় একটু জোর দিত।"[৭]

আর্থিক অনটনের কারণে প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনা ছেড়ে রোজগারের তাগিদ তৈরি হয়। ফলে তাদের শৈশব কাটে ঘুড়ি উড়িয়ে, গোবর কুড়িয়ে কিংবা চায়ের দোকানে কাজ করে। যখন তারা যৌবনে পা দেয়, তখন এই পিছিয়ে পড়ার গ্লানি থেকে বাঁচতে অনেকেই অন্ধ সংস্কার বা পরিকল্পনাহীন জীবনচক্রে আটকে যায়। ঔপন্যাসিক এখানে মূলত দরিদ্র পরিবারগুলোর অশিক্ষা এবং পরিবার পরিকল্পনার অভাবের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। জীবনের এই ব্যর্থতা থেকে সাময়িক মুক্তি খুঁজতেই অনেকে নেশার পথে পা বাড়ায়। এমন হতাশাজনক পরিস্থিতিতে আনসারের হাহাকার ফুটে ওঠে— "আমাদের শিক্ষা নেই, আমরা কী করব!"[৮]

ব্যক্তিগত এই জীবনসংগ্রাম থেকেই জন্ম নেয় সামাজিক তিক্ততা। মূলত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতি আনসারের যে চাপা ক্ষোভ, তার বীজ লুকিয়ে ছিল শৈশবের সেই অপূর্ণতায়। শিক্ষার অভাবে সে যখন কোনো শিক্ষিত বা উচ্চবিত্ত মানুষের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন নিজের অজান্তেই তার মধ্যে এক ধরণের হীনম্মন্যতা (Inferiority Complex) কাজ করে। নিজেকে 'ছোট' মনে করার এই নিদারুণ বোধ থেকেই সফল মানুষদের প্রতি তার মনে এক ধরণের বিদ্বেষ ও বিরক্তি তৈরি হয়। অর্থাৎ, আনসারের ব্যক্তিগত এই হীনম্মন্যতাই কালক্রমে সমাজের প্রতি এক প্রবল ক্ষোভ ও অভিমানে রূপান্তরিত হয়েছে।

শিক্ষার অভাব এবং জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়ার গ্লানি থেকেই অনেক সময় মানুষের মধ্যে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা দানা বাঁধে। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক কেবল সংখ্যালঘু হিসেবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাইরের জীবনসংগ্রাম নয়, বরং ধর্মের অভ্যন্তরীণ শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টিও নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। মুর্শিদাবাদ থেকে কাজের সূত্রে ব্রহ্মপুরে আসা রাজমিস্ত্রি সেন্টু শেখ এবং তার সঙ্গীরা মহরমের আগে যখন 'মরশিয়া' বা শোকগাথা গাইতে থাকে, তখন সুন্নি মতাদর্শে বিশ্বাসী আনসার একে 'না-জায়েজ' বলে মনে করে। ক্ষোভের বশে সে সেন্টুকে চড় পর্যন্ত মারে। সেন্টুকে আঘাত করার আগে আনসারের মনে হয়েছে:

> "আমরা সুন্নি। আমাদের এই সবই না-জায়েজি। পারলে মহরম মাসে রোজা রাখব, নয়তো নয়। মহরমের দিন তলোয়ার-লাঠি খেলব না। তাজিয়া, দুলদুল বের করব না। হা-হাসান, হা-হোসেন করে বুক চাপড়াব না। বাড়িতে এদিন গোস্ দিয়ে খিচুড়ি হবে। খাব। পবিত্র ভাবে

> মনকে রাখব। আর তা নয়, এই সব বুক চাপড়ে চাপড়ে গান, মহরমের আগের রাতে— বাবা জন্মে কোনো দিন দেখি নি।"[৯]

অন্যদিকে সেন্টু মনে মনে বলে—

> "আমরা শিয়া, তোদের মতো জমির লোভে মুসলমান হয়নি। ইরান থেকে বহুকাল আগে বহে আসা-রক্তধারা..."[১০]

লেখক এই ঘটনার মধ্য দিয়ে দুই গোষ্ঠীর ভিন্নধর্মী রীতিনীতি এবং তাদের পারস্পরিক বিরোধের এক বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়াও উপন্যাসে তবলিগি জামাত, চিল্লা, হজ, নামাজ, রোজা এবং ধর্মীয় নানা অনুশাসনের বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে তবলিগি সদস্যদের মনে পরকাল নিয়ে যে গভীর বিশ্বাস বা ভীতির ধারণা কাজ করে, তা লেখক সরাসরি তুলে ধরেছেন—

> "এই জীবন কোনো জীবনই নয়। মৃত্যুর পর যে অনন্ত জীবন, সেখানে বেহস্তে আমরা সবাই সুখে থাকব। তার জন্যে ইমানদার হওয়া দরকার, দীন হতে হবে, নয় তো দোজখের আগুনে... উঃ সে বড় ভয়ঙ্কর! ছোট হয়ে আসবে কবরের মাপ, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে শরীরের সব হাড়। সে বড় যন্ত্রণা। সেই যে সাপ লোহার নখে কেয়ামত পর্যন্ত তুলে আনবে তোমায়, তার পর আবার সত্তর ফুট নিচে ঢুকিয়ে দেবে। তুলবে। এভাবেই চলবে। চলবে।"[১১]

তবলিগি সদস্যরা যুবসমাজকে ধর্মের পথে বা মসজিদের শাসনে আনতে চাইলেও, আধুনিক প্রজন্মের মধ্যে সেই উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে লেখক এখানে কেবল ধর্মের নেতিবাচক দিকটিই দেখাননি, বরং ইসলাম ধর্মের মানবিক বিধানের কথাও বলেছেন। যেমন— নিজের অন্তত চল্লিশজন প্রতিবেশীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নিশ্চিত করে তবেই হজে যাওয়া যাবে। এইভাবে লেখক উপন্যাসে ইসলাম ধর্মের নানা রীতিনীতি, কুসংস্কার এবং পাশাপাশি মানবিক দিকগুলোকে অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে সংখ্যালঘু মানসিকতায় আনসারের মধ্যে প্রবলভাবে নিরাপত্তাহীনতা জন্ম নেয়। আশি ও নব্বইয়ের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, তৎকালীন ঘনীভূত ধর্মীয় মেরুকরণ এবং সাম্প্রদায়িক উত্তজনার যে গুমোট পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, সেই আবহে আনসার এদেশকে নিজের বলে ভেবে নিতে পারে না। তার ভাষায়—

> "মাঝে মাঝেই শুনি দেশটা হিন্দুদের হয়ে যাবে। মুসলমানদের ঝেঁটিয়ে তাড়াবে। মুসলমানরা এখানে জবাইয়ের মুরগি। কী হবে ঘর-বাড়ি করে! জমি বাড়িয়ে! মুসলমানের ছেলে তো চাকরি পায় না। আসলে আমাদের এডুকেশন নেই। মাথা তুলে তাই দাঁড়াতে পারি না।"[১২]

আনসার মনে করে ভারতীয়ত্বের নামে তার ওপর যা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়, তা আসলে এক ধরনের সংখ্যাগুরুর দাপট। সংখ্যাগুরু সমাজ আনসারের মতো মানুষদের সব সময় দূরে সরিয়ে রাখে। অনেকেই তাকে 'মোল্লার ছেলে' বলে ব্যঙ্গ করে, কিন্তু এই অপমান সে হাসিমুখে সহ্য করতে বাধ্য হয়। ভোটের সময় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের কদর থাকলেও, জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়া আনসারের কাছে ভোটাধিকারের কোনো মূল্য নেই। আনসার ভাবে—

> "মুসলমানের ছেলের এমনিই চাকরি হবে না। ভোঁট দিলেই বা কি! না দিলেই বা কি! সরকার কার, তোমার-আমার?"[১৩]

সাতচল্লিশ ও চৌষট্টির দাঙ্গার ক্ষত হিন্দুদের মতো অনেক মুসলমানের শরীর-মনে গভীর দাগ কেটেছে। অতীতের সেই আতঙ্কেই তারা নিজেদের চারপাশে এক অদৃশ্য দেয়াল তুলে নিয়েছে এবং নিজেদের ধর্মীয়

বিশ্বাসকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে। নিজেদের গুটিয়ে রাখার এই প্রবণতার কারণেই তারা আধুনিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করার সুযোগ পায়নি; আর তাদের ধর্ম কখন যে অন্ধ সংস্কারে পরিণত হয়েছে, তা তাদের অজানাই থেকে গেছে।

আনসারের হতাশ ও ক্লান্ত জীবনে কেবল রহিমা কিছুটা উষ্ণতা নিয়ে আসে। রহিমা সম্পর্কে আনসারের বড় ভাইয়ের স্ত্রী বা ভাবি। তাদের এই সম্পর্ককে ভালোবাসা না বলে, বরং শারীরিক তাড়না বলাই বেশি সংগত। তাই পরিবারেরই সদস্য শাগির যখন রহিমাকে ভোগ করে, তখন সামাজিকলজ্জার ভয়ে আনসার তাকে বাধা দিতে পারে না। অন্যদিকে রহিমা নিজেও স্বামীর অবহেলা ও অন্য পুরুষের লালসার শিকার। রহিমার স্বামী আকিল যখন পেশাগত কারণে বাইরে থাকে, তখন আনসার ও শাগির রহিমাকে কেবল ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করে। রহিমা ভাবে—

> "আমি কোথায় যাই! আমার স্বামী আমায় নেয় না। দুজন পুরুষ আমারে নিয়ে খেলা করে। খেলতে খেলতে সর্বনাশের বাঁকে দাঁড়ায়। আমার কী হবে?"[১৪]

রহিমা নিজের জীবন শেষ করে দিতে চাইলেও পারে না; কারণ সে বিশ্বাস করে আত্মহত্যা 'না-জায়েজ' এবং জীবনের প্রতি তার এক গভীর টানও রয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন রহিমা আশ্রয়ের মায়া ত্যাগ করে জনসমুদ্রে হারিয়ে যায়। রহিমার এই হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া আনসারের জীবনে এক বিরাট শূন্যতা তৈরি করে। আনসার ভাবে—

> "এই যে এত কাজ, কার জন্যে? অনন্ত বিহস্ত্ অথবা অনন্ত দোজখের হিসেব করে কাটাকুটি, যোগ বিয়োগফল কী হবে আমার জানা নেই। তবু তো খিদে থাকে ঘুম থাকে। রহিমার জন্যে শরীর, মন খারাপ হয়।"[১৫]

আনসার মনে মনে জানে রহিমার সাথে তার এই সম্পর্ক অন্যায়। রহিমার স্বামী তাকে ত্যাগ করলেও আনসার তাকে কোনোদিন গ্রহণ করতে পারবে না— এসব জেনেও সে এক বিষণ্ণ ও আশাহীন জীবনের গ্লানি বয়ে বেড়ায়। উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, চরম হতাশায় ডুবে থাকা আনসার নিজের সামনে যেন এক সমাধি-ভূমি দেখতে পায়। এক অজানা অন্ধকার তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে—

> "কবরের নিচে যে শীতল মরণ-ঘুম, কেয়ামতের দিনে জেগে ওঠার প্রতীক্ষায়—সেও তো আমার স্বপ্নে আছে।"[১৬]

পরিশেষে বলা যায়, কিন্নর রায় তাঁর 'অন্ধকারের ছবি' উপন্যাসে সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, তাঁদের অস্তিত্বের সংকট এবং ধর্মীয় রীতিনীতির এক অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ছবি তুলে ধরেছেন। প্রধান চরিত্র আনসারের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক কেবল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের যন্ত্রণাকেই দেখাননি, বরং দেখিয়েছেন কীভাবে অশিক্ষা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং নিরাপত্তাহীনতা একজন মানুষকে ক্রমশ এক অন্ধকার মনস্তাত্ত্বিক জগতের দিকে ঠেলে দেয়। একদিকে রহিমা বা আনসারের মায়ের মতো নারীদের টিকে থাকার লড়াই, অন্যদিকে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব কিংবা তবলিগি রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপ— সব মিলিয়ে উপন্যাসটি সংখ্যালঘু জীবন-বাস্তবতার এক প্রামাণ্য দলিল হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সঞ্চয়িতা। কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা ৯, প্রথম কামিনী সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৩৯।

২. অধিকারী, রণজিৎ (সম্পা.)। কিন্নর রায়ের ক্রোড়পত্র, পূর্ব। আশ্বিন ২০১২, পৃ. ২৯৩।

৩. নন্দী, সাথী। কিন্নর রায়ের সাহিত্য জীবন ও সাহিত্য ভুবন। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২০, পৃ. ১০৯।
৪. অধিকারী, রণজিৎ (সম্পা.)। কিন্নর রায়ের ক্রোড়পত্র, পূর্ব। আশ্বিন ২০১২, পৃ. ২৯৪।
৫. রায়, কিন্নর। অন্ধকারের ছবি। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ১০।
৬. তদেব, পৃ. ১২-১৩।
৭. তদেব, পৃ. ১৩।
৮. তদেব, পৃ. ২৪।
৯. তদেব, পৃ. ৩০।
১০. তদেব, পৃ. ৩০।
১১. তদেব, পৃ. ৪২।
১২. তদেব, পৃ. ৮৪।
১৩. তদেব, পৃ. ১২২।
১৪. তদেব, পৃ. ৬৬।
১৫. তদেব, পৃ. ১২৫।
১৬. তদেব, পৃ. ১২৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অধিকারী, রণজিৎ (সম্পা.)। কিন্নর রায়ের ক্রোড়পত্র, পূর্ব। আশ্বিন ২০১২।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সঞ্চয়িতা। কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা ৯, প্রথম কামিনী সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২।
৩. নন্দী, সাথী। কিন্নর রায়ের সাহিত্য জীবন ও সাহিত্য ভুবন। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২০।
৪. রায়, কিন্নর। অন্ধকারের ছবি। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯২।